সুরক্ষিত শ্রমিক, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

মো. খালিদ হাসান

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) প্রতি বছর ২৮ এপ্রিল 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস' হিসেবে পালন করে থাকে। ২০০৩ সালে এই দিনটি প্রথম আন্তর্জাতিকভাবে পালিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল কর্মক্ষেত্রে প্রতিরোধযোগ্য দুর্ঘটনা ও অসুস্থতার হার কমানো। বিশ্বজুড়ে কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইএলও বেশ কয়েকটি কনভেনশন গ্রহণ করেছে (যেমন - কনভেশন ১৫৫ এবং কনভেশন ১৮৭), যা বিভিন্ন দেশের শ্রম আইন প্রণয়নে প্রভাব ফেলেছে। এই দিবস আন্তর্জাতিকভাবে সরকার ও সংস্থাগুলোকে সেফটি সংস্কৃতিতে উৎসাহিত করে এবং কর্মক্ষেত্রকে একটি নিরাপদ জায়গা হিসেবে গড়ে তুলতে আহ্বান জানায়।

বাংলাদেশে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস' সরকারিভাবে পালন শুরু হয় রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির পরিপ্রেক্ষিতে। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারে রানা প্লাজা ধসে প্রায় ১,১৩৬ জন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু এবং হাজারো মানুষ আহত হন। এটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শিল্প-দুর্ঘটনা, যা গোটা বিশ্বের দৃষ্টি বাংলাদেশি শ্রমিকদের কর্মপরিবেশের দিকে ফেরায়। এই ঘটনার পর আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক সংস্কার ও সচেতনতায় একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, আইএলও এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিষয়টি গুরুত্ব পেতে শুরু করে। ফলস্বরূপ, ২০১৬ সালে সরকার ২৮ এপ্রিল দিনটিকে জাতীয় দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র মতে, পেশাগত স্বাস্থ্য মানে কেবল শারীরিক সুস্থতা নয়, বরং মানসিক ও সামাজিক সুস্থতাও এর অন্তর্ভুক্ত। কর্মক্ষেত্রে প্রতিদিন নানা ধরণের স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হয়। যেমন—অগ্নিকান্ড, বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা, ভারী যন্ত্রপাতির নিচে চাপা পড়া, উচ্চ শব্দে শ্রবণশক্তি হ্রাস, বিষাক্ত গ্যাস বা রাসায়নিক পদার্থে আক্রান্ত হওয়া, ধুলাবালুর কারণে শ্বাসকষ্ট বা ফুসফুসের জটিলতা, দীর্ঘ সময় বসে বা দাঁড়িয়ে কাজ করার ফলে হাড়-গাঁটের সমস্যা এবং মানসিক চাপে আক্রান্ত হওয়ার মতো ঝুঁকি প্রায়ই দেখা যায়। বিশেষ করে পোশাক, নির্মাণ, কৃষি ও চামড়াশিল্পের শ্রমিকরা এসব ঝুঁকির মুখে বেশি পড়ে থাকেন।

এমন পরিস্থিতি থেকে শ্রমিকদের সুরক্ষিত রাখতে কিছু নির্দিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। এর মধ্যে প্রধান হলো পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট বা সেফটি গিয়ার ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা—যেমন হেলমেট, গ্লাভস, মাস্ক, নিরাপত্তা জুতা, ফেস শিল্ড ইত্যাদি। কর্মস্থলে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, ফায়ার এলার্ম, জরুরি বহির্গমন পথ ও নিয়মিত ফায়ার ড্রিল নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইসাথে শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া, ঝুঁকি নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনায় তাদের সম্পৃক্ত করা এবং চিকিৎসা সহায়তা পাওয়ার সহজলভ্য ব্যবস্থা থাকাও জরুরি। নিরাপত্তার এই উপাদানগুলো কেবল শ্রমিকদের জীবন রক্ষা করে না, বরং একটি কর্মক্ষম ও উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের শ্রম বাজার দ্রুত বর্ধনশীল হলেও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এখনো বড় একটি চ্যালেঞ্জ। দেশের মোট শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ পোশাক, নির্মাণ, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং জাহাজভাঙা শিল্পে নিয়োজিত, যেখানে শ্রমিকদের প্রতিদিনই নানা ধরণের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়তে হয়। তৈরি পোশাক খাত দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস হলেও এই খাতে কাজরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা পরিস্থিতি এখনও পর্যাপ্ত নয়। রানা প্লাজা ও তাজরীন গার্মেন্টসের দুর্ঘটনা এই খাতের ভয়াবহ ঝুঁকির বাস্তব উদাহরণ হয়ে রয়েছে। নির্মাণ খাতে নিয়মিতই ভবন থেকে পড়ে যাওয়া, বৈদ্যুতিক শক, কিংবা ভারী যন্ত্রপাতির নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু বা গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। জাহাজভাঙা শিল্পে ব্যবহৃত বিষাক্ত পদার্থ, গ্যাস, ধাতব অংশ এবং ভারী বস্তুগুলোর কারণে শ্রমিকরা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকেন। চামড়াশিল্পে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে দীর্ঘমেয়াদি ত্বক ও শ্বাসজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার অত্যন্ত বেশি।

প্রতিবছর শ্রম মন্ত্রণালয় ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের শিল্প খাতে দুর্ঘটনার সংখ্যা উদ্বেগজনক। এক সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০২৩ সালে শুধু পোশাক ও নির্মাণ খাতে আনুমানিক ৬০০-এর বেশি দুর্ঘটনার রেকর্ড পাওয়া যায়, যার মধ্যে বেশ কিছু ছিল মারাত্মক। দুর্ঘটনার এই ট্রেন্ড বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের নিরাপত্তা সরঞ্জাম না থাকা, প্রশিক্ষণের অভাব এবং দুর্বল তদারকির কারণে এসব দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা শ্রেণির মধ্যে রয়েছে নারী শ্রমিক, অনানুষ্ঠানিক শ্রমিক ও অস্থায়ী কর্মচারীরা, যাদের অনেকেরই শ্রম আইন অনুযায়ী ন্যূনতম নিরাপত্তা সুবিধা নিশ্চিত করা হয় না। বিশেষ করে গার্মেন্টস, চামড়া ও হোটেল-রেস্টুরেন্ট খাতে নারী শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ অনেক সময় স্বাস্থ্যবিরোধী ও মানসিকভাবে চাপপূর্ণ হয়ে ওঠে। শিশু শ্রমিক এবং প্রান্তিক এলাকায় কাজ করা শ্রমিকরাও পর্যাপ্ত সুরক্ষা ছাড়া কাজ করতে বাধ্য হন। সার্বিকভাবে, শ্রমবাজারে নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে হলে কেবল আইন থাকলেই চলবে না, বরং তার কার্যকর প্রয়োগ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মালিক-শ্রমিক-সরকারের ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতা অপরিহার্য।

বাংলাদেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যতম প্রধান আইন হলো বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং এর সংশোধনী আইন, ২০১৮। এই আইনের অধীনে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যবিধি ও শ্রমিকদের কল্যাণ সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আইনটির ৫১ থেকে ৭৮ ধারা পর্যন্ত অংশে কারখানায় আলোকসজ্জা, বায়ু চলাচল, নিরাপদ পানীয় জল, বিশ্রামাগার, স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা ও আগুন প্রতিরোধক ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আইনটি কারখানার প্রতিটি কর্মীকে একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে কাজ করার অধিকার দেয় এবং মালিকপক্ষকে দায়িত্বপ্রাপ্ত করে এই পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য। এই আইনের বাস্তবায়ন ও তদারকির দায়িত্বে রয়েছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

সরকারি পর্যায়ে পেশাগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিমালায় দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে—যার মধ্যে রয়েছে ঝুঁকিনিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা, শ্রমিকদের সচেতনতা, সুরক্ষাসামগ্রী ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান, এবং ট্রেনিং ও গবেষণার সুযোগ সম্প্রসারণ। এই নীতিমালাকে কার্যকর করতে শ্রম মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি খাত, আইএলও, বিজিএমইএ, এবং ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর দেশে ও বিদেশে তৈরি হওয়া জনমত ও বাণিজ্যিক চাপের ফলে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার ও শিল্পখাতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদ্যোগ নেয়। 'অ্যাকোর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি' ও 'অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেফটি' এই দুই আন্তর্জাতিক উদ্যোগের মাধ্যমে প্রায় ২ হাজার ৩০০ গার্মেন্ট কারখানার কাঠামোগত ও অগ্নি নিরাপত্তা পরিদর্শন করা হয় এবং বহু কারখানায় সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে, এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় 'আরএমজি সাসটেইনেবিলিটি কাউন্সিল' গঠিত হয়, যা বর্তমানে গার্মেন্টস খাতে কারখানা পরিদর্শন, প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তা তদারকির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

সরকারি উদ্যোগের মধ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর তত্ত্বাবধানে ‘স্টেন্থেনিং লেবার ইন্সপেকশন সিস্টেম প্রজেক্ট’ উল্লেখযোগ্য, যা আইএলও ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল পরিদর্শন ব্যবস্থা, পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ, এবং শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর প্রায় ৪৪ হাজার পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে, যার মধ্যে গার্মেন্ট, নির্মাণ ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাত খাত অগ্রাধিকারভুক্ত ছিল।

কোনো শিল্প খাতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নিশ্চিত করতে উদ্যোক্তা ও শিল্প মালিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ শুধু নৈতিক দায়ই নয়, এটি একটি আইনি বাধ্যবাধকতা এবং টেকসই শিল্প উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বাস্তবে অনেক শিল্প মালিক এখনো নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বাড়তি ব্যয় হিসেবে দেখে থাকেন, ফলে এটি ব্যবসার অগ্রাধিকার তালিকায় স্থান পায় না। তবে বিগত কয়েক বছরে গার্মেন্টস ও চামড়া শিল্পে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের চাপ, বৈশ্বিক শ্রম মান বজায় রাখা এবং বিভিন্ন বাণিজ্য সুবিধা (যেমন – জিএসপি প্লাস) পাওয়ার জন্য অনেক মালিক পেশাগত সেফটি ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছেন।

তবে অধিকাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তার মধ্যে সেফটি বিষয়ক সচেতনতা এখনও সীমিত। অনেক ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা সরঞ্জাম বিনিয়োগের পরিবর্তে উৎপাদনে বিনিয়োগ বেশি গুরুত্ব পায়। এই মানসিকতা পরিবর্তন করা জরুরি। শিল্প মালিকদের উচিত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ করা, সেফটি গিয়ার নিশ্চিত করা এবং একটি দায়িত্বশীল কর্পোরেট সংস্কৃতি গড়ে তোলা—যেখানে 'সেফটি ফার্স্ট' নীতির বাস্তব প্রয়োগ ঘটে। কারণ, একটি নিরাপদ কর্মপরিবেশ শুধু শ্রমিকের জীবন বাঁচায় না, বরং উদ্যোক্তার ব্র্যান্ড ইমেজ ও দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদন সক্ষমতাও বাড়ায়। সার্বিকভাবে, আইন ও নীতিমালার কাঠামো থাকলেও বাস্তবায়নের ঘাটতি, সচেতনতার অভাব, এবং নিরীক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা এখনও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। তাই কেবল নীতিগত অঙ্গীকার নয়, বরং তার কার্যকর প্রয়োগ এবং মালিক-শ্রমিক-রাষ্ট্রের যৌথ উদ্যোগে একটি টেকসই নিরাপদ শ্রম পরিবেশ গড়ে তোলাই আজ সময়ের দাবি।

#

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার